ভূমিকা

চলমানতাই জীবনের ধর্ম। সময়ের ধারাবাহিক স্রোতে প্রতিনিয়ত বর্তমান হয় অতীত। সৃষ্টি হয় ইতিহাসের। রচিত হয় গল্প। আর এই গল্পই ধীরে ধীরে স্রষ্টার সৃষ্টিতে সাহিত্যের মর্যাদা লাভ করে। তবে ইতিহাস যেখানে মূক, সাহিত্য সেখানে কিন্তু সরব। ইতিহাস শুধু শাসককুলের ভাগ্য নির্ধারণের বিবরণ দিয়ে থাকে। সাহিত্যে থাকে শাসক থেকে শুরু করে সাধারণ জনজীবনের কথা। বঙ্কিমচন্দ্র ইতিহাস বলতে বোঝাতে চেয়েছিলেন দেশ শাসন, ধর্মবোধ, অর্থনীতি, সমাজ ব্যবস্থা, কৃষি, বাণিজ্য ইত্যাদি নানাবিধ বিষয়কে। নীহাররঞ্জন রায়ের লেখা 'বাঙ্গালীর ইতিহাস' ও অতুল সুরের লেখা 'বাঙলা ও বাঙালীর ইতিহাস' উক্ত আলোচনা সংক্রান্ত অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ দুটি বই।

মধ্যযুগের সাহিত্য মূলত দেব-দেবী নির্ভর ধর্মাশ্রিত সাহিত্য হলেও এসব সাহিত্যের সমস্ত অংশ জুড়েই রয়েছে মাটি ও মানুষের কথা। রয়েছে তৎকালীন রাজনৈতিক, সামাজিক ও অর্থনৈতিক পরিমণ্ডলের এক প্রচ্ছন্ন রূপ। তাই ইহলৌকিক জীবনকে উপেক্ষা করে কবিকল্পনা কখনই স্বর্গ রাজ্যে বিরাজ করতে পারেনি। মধ্যযুগের কবিরা দেব-দেবী নির্ভর সাহিত্য রচনা করলেও তাতে প্রকাশ পেয়েছে সাধারণ মানুষের সুখ-দুঃখ, হাসি-কান্নার কথা।

মধ্যযুগের বাংলা সাহিত্যের তিনটি ধারা দেখতে পাওয়া যায়— মঙ্গলকাব্য, অনুবাদ সাহিত্য ও বৈষ্ণব পদসাহিত্য। বৈষ্ণব সাহিত্যে ইহলৌকিক জীবনকে অনেকটাই উপেক্ষা করা হয়েছে। কিন্তু অনুবাদ সাহিত্য ও মঙ্গলকাব্যকে তৎকালীন যুগের বাঙালি জীবনের ইতিহাস বলা চলে। কাব্যে উল্লেখিত হয়েছে সমকালীন সমাজের রীতিনীতি, খাদ্য-পোষাক, পানীয় আচার-আচরণ ইত্যাদির বর্ণনা। তাই মধ্যযুগের বাঙালির জীবন ধারাকে জানতে গেলে মঙ্গলকাব্যগুলিকে পাঠ করতে হবে।

মঙ্গলকাব্যগুলি মোটামুটি পঞ্চদশ থেকে অষ্টাদশ শতাব্দীর কাল সীমায় রচিত। এ সময়কার উল্লেখযোগ্য মঙ্গলকাব্যগুলি হল—মনসামঙ্গল, চণ্ডীমঙ্গল, ধর্মমঙ্গল, শিবায়ন ও অন্নদামঙ্গল। এই দীর্ঘ সময় কালে শাসক ও সমাজের পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে কাব্যের মূল কাঠামো এক থাকলেও আভ্যন্তরিক রীতি-নীতি, খাদ্য, পোষাক, আচার-আচরণের পরিবর্তন ঘটেছে। আর্য-অনার্যের সংমিশ্রনে সৃষ্ট দেবতাদের নিয়ে রচিত চণ্ডীমঙ্গল কাব্যের শুরুতেই

রয়েছে গণেশ বন্দনা সহ পঞ্চদেবতার বন্দনা। কবিদের পার্থক্যভেদে বন্দনাংশে অনেক সময় স্থান করে নিয়েছেন লৌকিক দেবতারা। এরপর রয়েছে গ্রন্থোৎপত্তির কারণ বর্ণনা। সৃষ্টিরহস্য বর্ণনা, মনুর প্রজাসৃষ্টি ,প্রজাপতির শিবহীন যজ্ঞ, সতীর দেহ ত্যাগ, উমার তপস্যা, মদনভস্ম, রতির বিলাপ, গৌরীর বিবাহ, কৈলাশে হরগৌরীর দাম্পত্য জীবন, চণ্ডীর পূজা প্রচারের চেষ্টা, নানা বাধা বিঘ্ন অতিক্রম করে শেষে পূজা প্রচার এবং কার্য সমাপ্তি হলে স্বর্গভ্রষ্ট দেবতাদের পুনরায় স্বর্গে প্রত্যাবর্তন। এসব বিষয় প্রথাবদ্ধ রীতি মেনেই বর্ণনা করা হয়েছে। তবে এর পাশাপাশি বারমাস্যা (সুখের ও দুঃখের) নারীগণের পতিনিন্দা এবং চৌতিশাও চণ্ডীমঙ্গলের অপরিহার্য বিষয় হয়ে কাব্যে স্থান লাভ করেছে। পৌরাণিকতা ও লৌকিকতার সংমিশ্রণে সৃষ্ট চণ্ডীমঙ্গলের কাহিনিগুলিতে রয়েছে সংস্কৃতি ও ধর্মের সমন্বয়ের ও সংঘাতের সুর। পঞ্চদশ শতাব্দীতে তুর্কী বিজয়ের পরবর্তীকালে আমরা পেয়েছিলাম দেবী মনসাকে। আর ষোড়শ শতাব্দীর রাজনৈতিক প্রেক্ষিত পরিবর্তনের পর মাতৃ আরাধনায় বাঙালির মস্তিষ্কে ও অন্তরে স্থান করে নিলেন দেবী চণ্ডী।

'চণ্ডীমঙ্গল কাব্য' বাংলা মঙ্গলকাব্যের ইতিহাসে বিশিষ্ট স্থান জুড়ে রয়েছে। 'চণ্ড' শব্দের অর্থ উগ্র স্বভাব বা তীক্ষ্ণ। কিন্তু কাব্যের কাহিনিতে তার উগ্র স্বভাব অপেক্ষা বরাভয় মূর্তিরই আমরা অধিক সাক্ষাৎ পাওয়া যায়। মঙ্গল শব্দের অনুষঙ্গটির অর্থ কল্যাণ বা কুশল। তাই সম্ভবত কাব্যে আমরা তার প্রচণ্ড রূপের সাক্ষাৎ খুব স্বল্পই পেয়ে থাকি।

চণ্ডীমঙ্গল কাব্যে আমরা চণ্ডীকে দুটি রূপে পাই। পৌরাণিক চণ্ডী ও লৌকিক চণ্ডী। 'ব্রহ্মবৈবর্ত্তপুরাণ', 'কালিকাপুরাণ' অবলম্বনে কবিরা পৌরাণিক চণ্ডীর চরিত্র নির্মাণ করেছেন। অন্যদিকে লৌকিক চণ্ডী বাঙালির নিজস্ব প্রাণের সম্পদ। সাধারণ মানুষের মতো যার আচরণ। আর্য-অনার্যের সংমিশ্রনের ফলেই আমরা চণ্ডীর এ দুটি রূপ প্রত্যক্ষ করি।

চণ্ডীমঙ্গল কাব্যের প্রধান ও শ্রেষ্ঠ কবি হলেন মুকুন্দ চক্রবর্তী। তবে আদি কবি বলা হয়ে থাকে মানিক দত্তকে। পরবর্তীকালে দ্বিজমাধব ও রামানন্দ যতির মতো কবিদেরও আমরা পেয়েছি। মুকুন্দ চক্রবর্তীর 'চণ্ডীমঙ্গল' কাব্যের প্রথম মুদ্রিত রূপ পাওয়া যায় জয়গোপাল তর্কালঙ্কারের গ্রন্থে। যার প্রকাশ কাল ১৮১৯ খ্রিস্টাব্দে। তারপর আজ পর্যন্ত মুকুন্দের বহু সম্পাদিত গ্রন্থ প্রকাশিত হয়েছে এবং তা নিয়ে কাজও রয়েছে বিস্তর। কিন্তু আশ্চর্যের বিষয় অষ্টাদশ শতাব্দীর অন্তিম লগ্নের কবি রামানন্দ যতি বা রামানন্দ গোস্বামীর

'মঙ্গলচণ্ডীর গীত' বা চণ্ডীমঙ্গল নিয়ে গবেষণা অতি স্বল্প।

আলোচ্য অভিসন্দর্ভের প্রধান কবি মুকুন্দ চক্রবর্তীর চণ্ডীমঙ্গল কাব্যের সঙ্গে রামানন্দ যতির চণ্ডীমঙ্গল কাব্যের একটি তুলনামূলক অধ্যয়ন করা। প্রথম অধ্যায়ে রয়েছে চণ্ডীদেবীর স্বরূপ ও চণ্ডীমঙ্গল কাব্যধারা। সমকালীন রাজনৈতিক, সামাজিক ও অর্থনৈতিক পটভূমি উঠে এসেছে। দেবী চণ্ডীর উদ্ভব কীভাবে হয়েছে এবং চণ্ডীমঙ্গল কাব্যের রচয়িতাদের স্বল্প জীবনকথা ও কাব্য সম্পর্কে কিঞ্চিৎ আলোচনা করা হয়েছে। দ্বিতীয় অধ্যায়ে রয়েছে—মুকুন্দ চক্রবর্তী ও রামানন্দ যতির কবি কথা। মুকুন্দ চক্রবর্তী কাব্য মধ্যে নিজের বংশ পরিচয় দিয়ে গেছেন বলে তা আলোচনা করা বা গবেষণা করা সহজ হয়েছে কিন্তু রামানন্দ নিজের কোন পরিচয় কাব্য মধ্যে দিয়ে যাননি। ফলে কাব্যটি বিস্তারিত পাঠ করে গবেষণার মধ্যদিয়ে রামানন্দের পরিচয় সম্পর্কে একটা সংক্ষিপ্ত ধারণায় আসা সম্ভব হয়েছে। তৃতীয় অধ্যায়ে রয়েছে উভয় কবির কাব্যের কাহিনিগত তুলনা। রামানন্দ ও মুকুন্দ দুজনেই দুই ভিন্ন শতাব্দীর কবি তাই তাঁদের রচিত কাহিনির বিষয়বস্তু এক হলেও অভ্যন্তরীণ পার্থক্য রয়েছে বিস্তর। রামানন্দ প্রধানত মুকুন্দের সমালোচনার উদ্দেশ্যেই কাব্য রচনায় আত্মনিয়োগ করেছিলেন। চতুর্থ অধ্যায়ে রয়েছে—কাব্যশৈলীগত তুলনা। উভয়ের কাব্যে শৈলীগত মিল অমিল দেখানোই এই অধ্যায়ের বিষয়। পঞ্চম অধ্যায়ে রয়েছে—চরিত্র সৃষ্টিগত তুলনা। মুকুন্দ চক্রবর্তী ও রামানন্দ যতি তাদের সৃষ্ট চণ্ডীমঙ্গল কাব্যে চরিত্রগুলি কোথায় কোথায় ভিন্ন আচরণ করেছে। ষষ্ঠ অধ্যায়ের বিষয়—জীবনরসিক মুকুন্দ এবং সমালোচক রামানন্দ। মুকুন্দের কাব্যে জীবনরস ও রামানন্দের কাব্যে মুকুন্দের সমালোচনা কোথায় কোথায় রয়েছে সে বিষয়গুলিকে গবেষণার মাধ্যমে তুলে ধরার চেষ্টা করা হয়েছে।

আমাদের গবেষণার কাজটি পুথি নির্ভর নয়। প্রকাশিত গ্রন্থ নির্ভর। পরিশিষ্ট অংশে রামানন্দের মূল পাঠটি দেওয়া হয়েছে। কারণ রামানন্দ যতির পাঠটি প্রায় অপ্রকাশিত। অনিলবরণ গঙ্গোপাধ্যায় দুটি পাঠ মিলিয়ে একটি সম্পাদিত পাঠ করেছেন। গবেষণা করতে গিয়ে এশিয়াটিক সোসাইটির পাঠটির সঙ্গে তাঁর সম্পাদিত পাঠ্যের কিছু ত্রুটি চোখে পড়ছে। ফলে গবেষণা শেষে এশিয়াটিক সোসাইটি এবং অক্সফোর্ড মিউজিয়াম-এর পাঠ সহ অনিলবরণ গঙ্গোপাধ্যায়ের সম্পাদিত পাঠটি পরিমার্জন করবার চেষ্টা করা হয়েছে।